নিজেকে ভাঙতে চেয়ে : পঞ্চানন চক্রবর্তীর ছবিজীবন

দেবকুমার সোম এবার কলম ধরছেন শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তীকে নিয়ে। এক প্রচার-বিমুখ শিল্পীর চমকপ্রদ জীবন-কাহিনীর ছোঁয়া এই কলমে।

সেদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখিনি, শুধু দেখেছি তাঁর ধীমান হাতের সৃষ্টি নসীপুর রাজবাড়ির নতুন মিউজিয়ামে। চিত্রী বন্ধুর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা তাঁর হাতের কাজ, কিংবা হাতযশ ছবির বইয়ের পৃষ্ঠায়। শুনেছি তাঁর সম্পর্কে কৌতুককর কত কাহিনি। ফলে তাঁকে চিনেছি নিবিড়ভাবে তাঁর হাতের কারুকাজে। চিত্রী বন্ধুর মুখর উচ্ছ্বাসে। তিনি শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী। আমার মতো ছবি নিরক্ষর মানুষের অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো চক্রবর্তী মশাইয়ের বর্ণনা। কেমন মানুষ শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী? আজকের কেরিয়ার সর্বস্ব সব পেয়েছির দেশের মানুষ যারা, যারা সত্যিই বিশ্বাস করেন টু পাইস্ না কামালে কীসের শিল্প? কীসের শিল্পবেত্তা? কিংবা যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে রঙ-বে-রঙের টুপি পড়ে টুপি-সুলতান, তাঁদের কাছে পঞ্চানন চক্রবর্তী ডাইনোসর মাত্র। কলকাতা আর্ট কলেজের স্নাতক ঊনসত্তর সালে শহর কলকাতার সব আকর্ষণ ছেড়ে সেই যে লালবাগের গণ্ডপ্রদেশে এলেন, এ পর্যন্ত সেখানেই শিকড় চারিয়ে দেওয়া, সেখানেই তাঁর বসবাস। বড়ো আশ্চর্যময়। বড়ো চমকপ্রদ সেই কাহিনি। কিন্তু সে কাহিনির কথা মুখ আরম্ভের আগে আমাদের আর একটু অগ্রসর হতে হবে উপক্রমণিকায়। জেনে নিতে হবে কী ধাতু, কী রং, কী ক্যানভাসে গড়ে উঠেছে তাঁর চরিত্র। ফলে আমরা চারজন এক শীত অপরাহ্নে বহরমপুর থেকে যাত্র করেছিলাম লালবাগ। তাঁর নিবাস।

গাড়িতে যেতে যেতে কিছু কথা হচ্ছিল, যার অনেকটাই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু শ্রবণে অক্লান্তি। আমাদের প্রত্যেকের মুখে সোনালি শীতরোদ উচ্ছ্বাসময়। আমাদের মধ্যে যিনি নবীন, সেই তুহিনশুভ্র তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র। তুহিন দীর্ঘকাল গুরুচর্চা করেছেন। তাই তাঁর হক আছে মুখ্য বক্তার ভূমিকায়। কৃষ্ণজিৎ আবার চিত্রশিল্পী হিসেবে পঞ্চাননবাবুর অনুরাগী। মূলত তাঁর মুগ্ধতাই আমাতে সংক্রামিত। তিনিও বাচাল। বরঞ্চ মৃণাল থেকে যান স্বভাব

লাজুক। আমরা শুনতে থাকি পঞ্চাননবাবুর সম্পর্কিত বিবিধ কাহিনি। বহরমপুর থেকে কথায়-কথায় গাড়ি পৌঁছে যায় লালবাগ। লালবাগের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের (P.H.E.) উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্যটি দেখিয়ে আমার সাথীরা যুগপৎ আহ্লাদিত এবং দুঃখিত। আহ্লাদিত, কেননা পঞ্চাননবাবুর সৃষ্ট এই একটিমাত্র উন্মুক্ত স্থানের ভাস্কর্য তাঁরা আমায় দেখাতে পারলেন। আর দুঃখিত কারণ, ভাস্কর্যের ওপর গাঢ় সবুজ রঙের পোচ দিয়ে তাকে বিকৃত করা হয়েছে। এমনিতে এ রাজ্যে এখন মাত্রাতিরিক্ত সবুজ রঙের উল্লাস চোখে কর্কশতা আনে। তার ওপর এমন উন্মুক্ত ভাস্কর্যের ওপর বিকৃত রং চাপানো আমাদের কাছে নীচু মনের পরিচয় মনে হয়। প্রসঙ্গটি পঞ্চাননবাবুর সামনে তুললে তিনি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বিষয়টিকে অকিঞ্চন করে দেন এই বলে : যাক, যা ইচ্ছে করার করুক। আমার যা করার আমি করেছি, ওদের যা করার তাই হোক। সমালোচনার কোনো জায়গা নেই। যে জায়গা আমি ছেড়ে এসেছি, সে জায়গা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। সত্যিই তো পুরোন বিষয় নিয়ে তাঁর কিছু বলার নেই। তাঁর হাতের কাছে প্রচুর নতুন নতুন উপকরণ। এই যেমন সকালবেলায় ফেরিওলা ছানা বিক্রি করতে এসেছিল, তার কাছ থেকে কিছু শালপাতা জোগাড় করে তাই নিয়ে সকাল থেকে বসে পড়েছিলেন কোলাজধর্মী শিল্পকর্মে। সামান্যই সে কাজ,

ক্ষণস্থায়ী শালাপাতার মধ্যে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সৃষ্টি করেছেন উড়ন্ত হরিণ, মায়ের কোলে শিশু কিংবা রবীন্দ্রনাথ। এ কাজ কেই বা দেখবে? কেই বা কদর দেবে? সে-সবে চিন্তিত নন শিল্পী। নদীর মতো বাঁধনহারা তাঁর আবেগ। তাঁর আদরের নাতির সঙ্গে তিনিও শিশুর মতো নির্লোভ যশলাভে।

আমরা পৌঁছে দেখলাম তিনটি বড়ো কাজ। দুটি কাগজের কোলাজ; সম্পূর্ণ। অপরটি কাঠের পাটাতনের ওপর টিনশীটের ঘোড়া। উড়ন্ত। হাতের চাপের রকমফেরে ধারালো চাকু দিয়ে সেই টিনশীটে এমন অবয়ব তৈরি করেছেন, যেন রূপালি ঘোড়া অলৌকিক উড়ন্ত। এই কাজগুলো ফরমাইশি। CIMA আর্ট গ্যালারির কোনো প্রদর্শনে যাবে। কিছু পুরোন কাজ কি দেখাবেন না? প্রশ্ন করি আমরা, কিছুটা অধৈর্য। তাঁর বাড়ির ঘরে ঘরে ঘোড়ার ছবি, কুকুরের ছবি। জলরঙে চায়ের দোকান। কাগজের মণ্ড দিয়ে লাইফসাইজ বাউল, রবীন্দ্রনাথ। আর সরু অ্যালুমিনিয়মের তার দিয়ে কুকুর, ঘোড়া, মানুষের মুখ, বাউল, রবীন্দ্রনাথ। দেখলেই বোঝা যায় এই মাধ্যমে

তিনি কতটা পারঙ্গম। মাত্র একটাই তার ঘুরিয়ে-পেচিয়ে একটা কুণ্ডলী পাকানো কুকুরে পরিণত করা যায় ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। তিনি শিশুর মতো হাট খুলে দিলেন। আমরা মুগ্ধ। মুগ্ধতর। জলরঙের চায়ের দোকানের ছবিটি বিশিষ্ট। কারণ তার ডিটেলিং। পেপারের সমস্ত স্পেসটা জুড়ে হরেক চরিত্র। মানুষ, কুকুর, সাইকেল এমনকী চায়ের কেটল, উনুন, সব, সব তাদের নিজস্বতা নিয়ে বাঙ্ময়। চোখের সামনে যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে চায়ের দোকান। দোকানের কোলাহল। উনুনের ধোঁয়া।

বুঝলেন, ঊনসত্তর সালে আর্ট কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার পরে গ্রাম দেখতে বের হলাম। একদিন কিছু না জেনেই রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়ি। ভোরবেলা পৌঁছাই এখানে। থাকার জায়গা কিছু নেই। কোন ভাবনাও যেন নেই, অথচ, জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেলাম। এত সবুজ। নরম শীতরোদ, মন্দ বাতাস, কোলাহল যেটুকু তা পাখির কাকলি। ছবি আঁকার জন্য, জীবন যাপনের জন্য ঠিক এমনই একটা জায়গা মনে মনে যেন তিনি খুঁজছিলেন। মন প্রসন্ন হয়ে গেল। এখানকার মিউজিয়াম দেখলাম, ভাগিরথীর স্বচ্ছতা দেখে মুগ্ধ হলাম। আর শেষমেশ চাকরিও জুটে গেল এখানকার নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে। স্বপ্নের মতো ঘটে গেল। পেছনে পড়ে রইল শহর কলকাতা। পড়ে রইল আর্ট কলেজের বন্ধুরা। কলেজের কোলাহল মুখরতা। পিছরে সব টান ছিঁড়ে তিনি হাজির হলেন অজ পাড়া গাঁয়ে। সেখানে বেছে নিলেন শিল্পী জীবন। যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ ছিল খুব জরুরি এক শর্ত। কিন্তু তাপসের মতো নির্জন পরবাস কি একজন শিল্পীর কাম্য? ভিনসেন্ট আর্ল প্রদেশে সারাজীবন কাটান নি, গঁগ্যা তাহিতিতে নিজের সবটা ঢেলে দেননি। কারণ, শিল্পীকে তাঁর কাজের স্বীকৃতির জন্য নগর জীবনে বারবার ফিরে যেতে হয়। নিজের ছবির প্রদর্শন, ছবি ঘিরে আন্দোলন, অন্য শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতা, সব, সবকিছুর জন্য নগরে ফিরতে হয় শিল্পীকে। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন চুলোয় যাক স্বীকৃতি। আমি এই অজ পাড়াগাঁয়েই থাকব। ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করব শিল্পবোধ। তারাই আগামিদিনে শিল্পময় জীবন যাপন করবে। তা হলে কি বিস্মিত হতে হয়? ছবি এঁকে পয়সাকড়ি করা, দুর্গাপুজোর থিম তৈরি করা ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন পরিণত বয়সে লিখেছিলেন, সারাজীবন ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে যদি একটা গাছ পুঁততেন, তবে হয়ত জীবনের সার্থকতা লাভ করতেন। পঞ্চাননবাবু সেই কাজটাই করে গেছেন নিজের মনে।

লালবাগের বাড়িতে এককালে টোল ছিল তাঁর। বাড়ির পেছন দিকে টিনের শেডের ঘরে ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখাতেন। নাম তার পটঘর। সেখানে আছে একটি পূর্ণাবয়ব বাউল মূর্তি। খবরের কাগজের মণ্ড দিয়ে সৃষ্ট সেই বাউল তাঁর একটি বিশিষ্ট কাজ। একদিন নাতি চাইল রং করে দিতে, দাদু না করলেন না। সেই শিল্পকর্মটিকে ছোট্ট ছেলে আপাদমস্তক রং করে দিল। কাজটি তার স্বকীয়তা হারাল। দাদু ক্ষুণ্ন হলেন না, নাতির হাতের কাজ তারিফ করলেন। এই হলেন শিল্পী পঞ্চানন। নসীপুর রাজবাড়ি নবসংস্করণের পরে কর্তৃপক্ষ স্থায়ী ছবির প্রদর্শনীর জন্য তাঁর দ্বারস্থ হলেন। পঞ্চাননবাবু হাত উজাড় করে দিলেন। কিন্তু ছবিগুলো টাঙিয়ে রাখা ছাড়া রাজবাড়ির লোকেরা আর কিছু করলেন না। শিল্পী ব্যথিত হলেও কিছুই বলতে পারেননি। তাঁর দর্শন হল আমার কাজ আমি করেছি, অন্য কী করবে, তার দায় আমার নয়। গৃহকোণে বসে ছবি আঁকায় নিমগ্ন থাকাই তাঁর অভীষ্ট। রামকিঙ্করের মতো তিনিও পার্থিব সফলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই আজকের সাদামাটা সংজ্ঞায় তিনি শিল্পী নন, সাধকও নন, বরং একজন নির্মোহ মানুষ। নিজের কাজ সম্পর্কে যাঁর এতটুকু প্রত্যাশা কিংবা স্যাটিসফেকশন নেই। তাই জলরং থেকে তেলরং, তেলরং থেকে কোলাজ। মাটির কাজ। ধাতু, ব্রোঞ্জ, টিন, তার, শুকনো পাতা, বিবিধ মাধ্যমে বারবার নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়ে নিজেকে পাল্টেছেন। পুনরাবৃত্তিকে তিনি অগ্রাহ্য করে, বারবার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে আমরা কেবল ঋদ্ধ হইনি, ঋণীও হয়েছি বিস্তর। স্যার, আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম একটা ছুতো মাত্র। আমি আপনাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম একবার।